Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 01 - 08
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

চৈতন্যদেবের দাম্পত্য জীবন ও বৈষ্ণব ধর্মের উত্থানের প্রেক্ষাপট

শম্ভু নাথ পাল
Email ID : shambhupal246@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Chaitanya, Bengali, marriage, Literature, Vaishnava, Love, Wife, Biography, Life.

Abstract
A new addition or chapter in the history of Bengali literature is the appearance of Sri Chaitanya in the fifteenth century. His arrival created a new tide in the center of Bengali literature. In Bengali literature, he is a person who brought a wave of change in human consciousness through his life work in the heart of the entire Middle Ages. As a result of that, Vaishnava terminology became so rich in Bengali literature that Vaishnava terminology has been divided based on him. Namely-Pre-Chaitanya Yuga, Chaitanya Contemporary Yuga and Post-Chaitanya Yuga. And the birth of this Chaitanya Mahaprabhu is an unforgettable event, which turned the corner of Bengali literature. Chaitanyadev was born in Nadia district. He was very scholarly at birth. And through scholarship, he has spread the light of knowledge from the entire city to the country. We have gone through stages from his childhood stage to his youth marriage and his married life. We know from the various works of Chaitanya's biographers that his married life was not at all happy. He first married a girl named Lakshipriya Devi. Accidentally, his death was caused by snakebite. In such a situation Chaitanyadev was completely broken. Seeing the consequences of this extreme disaster in his domestic life, Chaitanyadeva's mother asked him to marry a second time. Forced, Chaitanyadeva somehow consummated the second marriage. He was no longer interested in his family. So he eventually had to give up domestic life and we see him taking monasticism near Ishwarpuri. In fact, it was the burning wound in Chaitanyadeva's heart from the death of his first wife that prevented him from concentrating on his second marriage. As a result of which it was not possible for Chaitanyadev to have a family life with his second wife. Mainly we have discussed Chaitanyadeva's married life, but we have also given due importance to his sannyasya and Harinam sankirtana. Where we see, after accepting the Vaishnava religion, Chaitanya Dev single-mindedly showed the way of world liberation to the people through Harinam Japa. That is, if we review Chaitanyadeva and his entire biography, we see a cruel, painful form of his married life. On the other hand, perhaps for that reason, the deep hurt in Chaitanya Dev's heart awakens a deep sense of compassion and love for the dormant people existing in Chaitanya's heart, there are examples throughout Bengali literature.

Discussion

ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্যের এক অন্যতম যুগপুরুষ চৈতন্যদেব। বাংলা সাহিত্যে নবতম সংযোজন কাব্য। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে মানুষের চেতনার পরিবর্তন ঘটে। তাই মধ্যযুগের ভক্তিভাবনা উনিশ শতকে এসে পরিবর্তিত হয়ে যুক্তি বাদী হয়ে, ওঠে ফলস্বরূপ মধ্যযুগের ভাবনায় চৈতন্য যেখানে ঈশ্বরের মহিমায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি উনিশ শতকে হয়ে উঠলেন নব্য মানবতাবাদের মূর্ত-বিগ্রহ। বর্ণ বিভাজিত সমাজকে তিনি মানেননি তার মতে মানুষের উপর জাতি ধর্ম কখনো স্থান পেতে পারে না। মানুষকে ভালোবাসাই ঈশ্বরকে ভালোবাসা জন্মের জন্য মানুষ দায়ী নয়, কর্মের মানদন্ডে মানুষের বিচার হওয়া উচিত। আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা চৈতন্যকে ব্যক্তি মানুষ রূপে দেখি মধ্যযুগের পরিমন্ডলে দাঁড়িয়ে তিনি সর্বপ্রথম স্বনির্বাচিত কন্যা বিবাহ করেছিলেন আবার তিনিই প্রথম নাম সংকীর্তন এর মধ্য দিয়ে ধর্ম আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানুষকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছিলেন, আবার চৈতন্যের দাম্পত্য জীবনের দিকে দৃষ্টি রাখলে আমরা দেখি যে বনমালী ঘটকের সহযোগিতায় বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে চৈতন্যেপর প্রথম বিবাহ সংঘটিত হয়। তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল সু-মধুর। যদিও ফলস্বরূপ চৈতন্য গৃহ জ্যোতিধামে পরিণত হয়েছিল। এরপর চৈতন্যদেব পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণে গেলে দীর্ঘদিন চৈতন্য বিরহের স্থির থাকতে না পেরে লক্ষীপ্রিয়া দেবী মারা যান। যদিও অন্য চৈতন্য জীবনী কারেরা মৃত্যুর কারণ হিসেবে সর্প দংশনকে চিহ্নিত করেছেন। চৈতন্যের প্রথম বিবাহ জীবন দু'বছর স্থায়ী হয়েছিল।শচীমাতার অনুরোধে লক্ষিপ্রিয়া দেবী মারা যাবার পর চৈতন্য বিবাহ করেন রাজ পন্ডিত সনাতনকন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে তবে এই বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী কি চৈতন্যের যোগ্য সহধর্মিনী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন কোথাও যেন তাদের দাম্পত্য জীবনে একটা ফাঁক থেকে গিয়েছিল তাই তো গয়া চলে যান দাম্পত্য জীবন থেকে মুক্তি লাভ করতে। এক কথায় আমাদের মনে আসে গয়া থেকে ফিরে আসলে বিষ্ণুপ্রিয়া ও শচীমাতা আনন্দিত হলেও চৈতন্য কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে আনন্দিত হননি বরং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। এর পরবর্তীকালে বিবাহিত পত্নীকে ঘরে রেখে তিনি সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন চৈতন্যের জীবনে অনেকটা উপেক্ষিত থেকে গেছে বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী।

বিভিন্ন চৈতন্যজীবনীকার চৈতন্যকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবতে চৈতন্যকে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার রূপে দেখেছেন। ধর্মসংস্থাপনের জন্য সর্বদেবতার দেবতা বিষ্ণু দ্বাপর যুগের শেষভাগে বাসুদেব কৃষ্ণ রূপে অবতীর্ন হয়েছেন। বৃন্দাবন দাস শ্রীচৈতন্যকে বিষ্ণু-কৃষ্ণের কলিযুগের অবতার রূপে প্রতিষ্ঠা দেবার চেষ্টা করেছেন। তিনি মূলত আর্বিভূত হয়েছেন নামসংকীর্তনের মধ্য দিয়ে, ধর্মপ্রচার করে কলিযুগের মানুষকে মুক্তির পথ দেখাতে। আবার কৃষ্ণদাস কবিরাজের গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণ ও রাধার একাত্ম মূর্তি রুপে দেখেছেন। আসলে কৃষ্ণ ও রাধা অভেদ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা। একদা ব্রজলীলায় তিনি ভিন্ন দেহ ধারণ করেছিলেন। এখন নবদ্বীপ লীলায় সে ভিন্নতা ও দ্বিখণ্ডত্ব লুপ্ত হইয়া গেল সেইজন্য চৈতন্যলীলা কৃষ্ণলীলার উর্দ্ধে।

তবে এভাবে বিভিন্ন রচনাকারের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির কথা বাদ দিয়ে চৈতন্যকে আমরা আধুনিক মনন দিয়ে দেখলে তাকে একজন ব্যক্তি মানুষ রূপে দেখতে পাই যিনি নব্যমানবতা বাদের মূর্ত প্রতিভূ।

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখলে চৈতন্য একজন ব্যক্তি মানুষ। তিনি জন্মগ্রহন করেছেন শচীমাতার গর্ভে। বৃন্দাবন দাস লিখছেন, চন্দ্রগ্রহনের সময় যখন সমস্ত নবদ্বীপ সংকীর্তন মুখরিত, সে সময় নিমাই শচীগর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হলেন। জন্ম তারিখ ১৯ ফ্রেব্রুয়ারী ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে। এবং তার জন্মের অব্যবহিত পরেই চতুর্দিকে হরিনাম ধ্বনিত হয়ে উঠল যেন। বৃন্দাবন দাস বলছেন –

> "আদিখণ্ডে, ফাল্গুন-পূর্ণিমা শুভদিনে।
> অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে।।
> হরিনাম-মঙ্গল উঠিল চতুর্দিগে।
> জন্মিলা ঈশ্বর সঙ্কীর্ত্তন করি আগে।।"[১]

জগন্নাথ মিশ্র ও শচীমাতার কনিষ্ঠ সন্তান তিনি। তাঁর দাদার নাম ছিল বিশ্বরূপ। দাদার সাথে নামের মিল রেখেই হয়তো নীলাম্বর চক্রবর্তী তাঁর নাম রেখেছিলেন বিশ্বম্ভর। আর শচীদেবী নাম রেখেছিলেন নিমাই।

নিমাই বাল্যকালে যথেষ্ট দুরন্ত বালক ছিলেন। ব্রাহ্মনদের গায়ে যেমন পায়ের জল ছিটিয়ে দিতেন, অনুরুপ ভাবে বালিকাদের বস্ত্রও লুকিয়ে রাখতেন। বালিকারা এর জন্য তার মায়ের কাছে অভিযোগও করেছে। শৈশব চাপলে সমস্ত নবদ্বীপবাসীর জ্বালাতন হয়েছিলেন। বিশেষত শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পন্ডিতেরা তাঁহার শাস্ত্রাচারে উপেক্ষার জন্য তাঁহার প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আছেন। তাঁহার বাল্যজীবনে তাঁহার এই দুরন্তপনার মধ্যে দিয়া তাঁহার আরাধ্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণের কৈশোর লীলার ছায়াপাত হয়েছিল। শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি টোল খুলিলেন ও তাঁহার অসাধারণ অধ্যাপনা-নৈপুণ্যে ও প্রগাঢ় বিদ্যাবত্তার জন্য শীঘ্রই প্রসিদ্ধি অর্জন করিলেন। কথিত আছে যে এই সময় তিনি ন্যায়-শাস্ত্রের একখানি টীকা রচনা করেন, কিন্তু তাঁহার বন্ধু নব্যন্যায়ের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনাথ শিরোমণির টীকা অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ হওয়ায়, বন্ধুর যশ অক্ষুণ্ণ রাখতে তিনি স্বরচিত টীকাখানি গঙ্গাতে নিক্ষেপ করেন। পাশাপাশি তিনি বাল্যকালে অত্যন্ত দুরন্ত ও অসাধারণ মেধাবী ছিলেন। শোনা যায়, শচীদেবী কখনো ক্রোধান্বিত হয়ে তাঁর আঁচলের মণিকে কথা শোনাতেও ছাড়েনি এবং কখনো কখনো মাতা শচীদেবী পুত্রকে শাসন করতে উদ্যত হয়ে বলেছেন –

“নিমাঞি আইলে আজি এড়িল বান্ধিয়া।
আর যেন উপদ্রব না করে কভু গিয়া।।”

আবার লোচন ও জয়ানন্দের কাব্যের অন্য এক দৃশ্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষন করে। সেখানে দেখা যায় নিমাই ইট দিয়ে শচীমাতার মাথায় প্রহার করে। আর এই ইস্টকের আঘাতে শচীমাতা মূর্ছা যায়। দৌরাত্মের আরও নানা শত দৃষ্টান্ত বিভিন্ন চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ হতে আমরা পাই। একদিন মুরারি বৈদ্য রাস্তায় যাবার সময় শাস্ত্র ব্যাখ্যা করছিলেন। নিমাই সে সময় বন্ধুদের সঙ্গে খেলছিলেন। তিনি প্রথমে নাক, মুখ বিকৃত করে উপহাস করেন বৈদ্যকে। মুরারি তাকে অপমান করলে, চৈতন্য যা করে তাতে আজও আমরা শিউরে উঠি। এরপর চৈতন্যের শিক্ষাজীবনের কথায় আসা যাক বালক নিমাই কবে পড়াশোনা শুরু করলেন? কীভাবে সে শিক্ষা এগোল? তাও কিন্তু এই জীবনীগ্রন্থগুলিতে একইভাবে বিবৃত হয়নি। বৃন্দাবন দাস লিখেছেন – ‘দৃষ্টি মাত্র সকল অক্ষর শিখি যায়’। এ শিশু আর পাঁচজনের থেকে আলাদা তো হবেনই। কারণ তিনি বৃন্দাবন দাসের চোখে অবতার। জয়ানন্দ নিমাইয়ের হাতেখড়ির প্রসঙ্গ এনেছেন অন্যভাবে। সেকালের বিখ্যাত পণ্ডিত সুদর্শনের বাড়িতে তার হাতে খড়ি হয়েছিল। জয়ানন্দ দেখাচ্ছেন একেবারে শিশু বয়সেই নিমাই সুদর্শন পন্ডিতের সঙ্গে তর্ক শুরু করেন। পিতা জগন্নাথ মিশ্রের ধারনা হয়েছিল অতিরিক্ত মাত্রায় পাঠই বিশ্বরূপের সন্ন্যাস গ্রহণের অন্যতম কারণ।

> “চৈতন্যের সন্নাস গ্রহন করিবার অব্যবহিত কারণ কি তাহা বলা দুষ্কর। বৃন্দাবন দাস বলিয়াছেন যে ভাবাবিষ্ট চৈতন্যকে কৃষ্ণনামের পরিবর্তে গোপীনাম জপ করিতে শুনিয়া কোন কোন পড়ুয়া অনুযোগ করায় তিনি তাহাদের মারিতে গিয়াছিলেন। ইহাতে নবদ্বীপের কোন কোন লোক তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল। ইহা বুঝিয়া চৈতন্য খেদ করিয়া একটি হেঁয়ালি ছড়া বলিয়াছিলেন। সে ছড়াটি চৈতন্যভাগবতে উদ্ধৃত আছে। এটিকে চৈতন্যরচিত একমাত্র বাঙ্গালা পদ বলিয়া নেওয়া যাইতে পারে।”[২]

পরবর্তীকালে শচীমাতার ব্যাকুলতায় চৈতন্যকে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের টোলে পাঠ শিক্ষার জন্য পাঠানো হয়।

চৈতন্যজীবনী গ্রন্থ থেকে জানা যায় শুধু যাবার সময়টুকু বাদ দিয়ে সময় পেলেই নির্জনে পুস্তকের চর্চা চালাতেন তিনি। ছাত্রাবস্থাতেই ব্যকরণ শাস্ত্রের মৌলিক টীকা নির্মান করতে পারতেন। শাস্ত্র জ্ঞানে তিনি এতটাই দক্ষ ছিলেন যে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতকেও পরাস্ত করতে পেরেছিলেন। আবার ‘চৈতন্যভাগবত’ গ্রন্থে চৈতন্যদেবের লক্ষী প্রিয়াদেবীকে দেখে পূর্বরাগের একটা লক্ষন ফুটে উঠেছে। এর মধ্য দিয়ে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যকে অবতার রূপে চিহ্নিত করতে চাইলেও আমাদের আধুনিক দৃষ্টিতে এটা বাস্তব নরনারীর পূর্বরাগের লক্ষণ। এরপর শচী মাতার কাছে বনমালী লক্ষীপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে চৈতন্যের বিবাহের কথা বলেন। প্রাথমিকভাবে শচীমাতা রাজি না হলেও পরে চৈতন্যের মনগত ইচ্ছাকে স্থান দিতে তিনি এই বিবাহ মেনে নেন। মধ্যযুগের পরিমন্ডলে দাঁড়িয়ে স্বনির্বাচিত কন্যা বিবাহ চৈতন্যকে এক অন্য মাত্রা দান করে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মধ্যযুগের বুকে ভর করে এর উদাহরণ রয়েছে কিছু সংখ্যকও। আমরা 'গণ' বলতে জনসাধারণ অর্থে বুঝে থাকি। আর বর্তমান যে অর্থে গণআন্দোলন বা গন নেতা শব্দটির প্রয়োগ হয়, সে অর্থে বাংলার প্রথম গণ আন্দোলনের নেতা নিমাই। একই সঙ্গে একথাও বলা যায় বাংলায় অসহযোগ আন্দোলনের প্রথম নেতা শ্রীচৈতন্যদেব। বাংলায় সংকীর্তন ছিল কিন্তু নামসংকীর্তন ছিল না। বাংলায় প্রথম নাম সংকীর্তন আনেন নিমাই। তিনি নাম সংকীর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষকে মুক্তির পথের পথিক করতে চেয়েছেন। এই নামসংকীর্তনের মধ্য দিয়েই তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়েছেন। বাংলায় প্রথম গন আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন চৈতন্য দেব। এদিক থেকে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। বিদ্যাসাগরের আগে স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারে চৈতন্যের অবদান আছে। জাহ্নবী দেবী, সীতাদেবীরা শুধুমাত্র পড়াশুনা করেননি, হয়েছিলেন ধর্মগুরু। আজ একবিংশ শতকেও যা অভাবনীয়। চৈতন্য যত না ধর্মগুরু তার থেকে অনেক বেশি প্রতিষ্ঠান বিরোধী, রাজনীতি সচেতন, সমাজ সংস্কারক, শিক্ষা সংস্কারক, নতুন সংস্কৃতির উদ্যোক্তা।

চৈতন্যের মারা যাবার সময়টি গবেষকদের মতে ১৫৩৩ খ্রিস্টাব্দের ১৯ জুন। কিন্তু কীভাবে তার তিরোধান ঘটেছিল তা নিয়ে এক অদ্ভুত রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। বৃন্দাবনদাস ও কৃষ্ণদাস কবিরাজ কেউই এই তিরোধান সম্পর্কে কোনো ভাবনা ব্যক্ত করেননি।কবি জয়ানন্দ অনেকটা বাস্তবভাবে মহাপ্রভুর তিরোধানকে দেখেছেন। তাঁর মতে আষাঢ় মাসের রথের সময় চৈতন্য নাচানাচি করেছিলেন সেই সময় ইষ্টক বিদ্ধ হয়ে চৈতন্য মারা যান। তবে এমত নিয়ে বিভিন্ন ব্যাক্তির মত ভিন্ন।

> "ফরাসী পণ্ডিত রোমা রোঁলা ব্যক্ত করেছেন মহাপ্রভু মারা গেছেন মৃগীরোগে। রিচার্ডস সিরিলের মহাপ্রশ্ন আর জিজ্ঞাসা যদি মহাপ্রভুর এপিলেপসিতে মৃত্যু হয় তবে নিশ্চয়ই তাঁর সমাধিক্ষেত্র থাকবে। পরমবৈষ্ণব রিচার্ডস সম্বন্ধে একটু বলি। বাল্যকাল হতে তিনি জানতেন যে, তাঁদের গ্রামের এক গরীব ঘরের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে। বাবা, মা পাত্রী-নির্বাচন করেছেন আর রিচার্ডস এই বিয়েতে নিজের সম্মতি দিয়েছিলেন। পরে সহয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণকালে এক ধনী কন্যাকে ভালবেসে ফেললেন। ভুলেই গেলেন গ্রামের সেই বাগদত্ত। গরীব মেয়ের কথা। গ্রামের মেয়ে যখন জানলেন রিচার্ডস তাকে পরিত্যাগ করে ধনী কন্যাকেই বিয়ে করবেন, তখন সেই মেয়ে বছরের পর বছর কেঁদে কেঁদে না খেয়ে শুকিয়ে শুকিয়ে আত্মহত্যা করে। রিচার্ডস কয়েক বছর পর গ্রামে এসে সেই মেয়ের আত্মহত্যার কথা জানলেন। তখন বিবেকের দংশনে আর অনুতাপে নিজেও কাঁদতে লাগলেন। ধনী-কন্যার দিকে অর ফিরেও তাকালেন না। প্রাণে তাঁর শান্তি নেই। সাক্ষাৎ হ'ল পাশ্চাত্যে ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তি বেদান্তস্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে। প্রভুপাদ তাঁকে শান্তির পথ দেখালেন। অহরহ কৃষ্ণনামে ডুবে থাকতে। রিচার্ডস মদ, মাছ, মাংস সব পরিত্যাগ করেছেন। গীতা আর চৈতন্য চরিতামৃত তাঁর কণ্ঠস্থ, প্রাণে এসেছে শান্তি। তিনি নীলাচলে এসে অনুসন্ধানে মহাপ্রভুর সমাধিক্ষেত্র পেলেন না। প্রশ্ন- দেহাবসান হ'লে অন্যান্য কৃষ্ণভক্ত- গণের মত তাঁরও সমাধিক্ষেত্র থাকবে। অনুসন্ধানে জানলেন মহাপ্রভু তাঁর জীবদ্দশার শেষ দিকে কাশীমিশ্র ভবনের গম্ভীরার মেলেতে কৃষ্ণনামে ব্যাকুল হয়ে তাঁর নয়নাশ্রু দিয়ে শ্রীকৃষ্ণের রূপ অঙ্কিত করে তাঁরই উপর নিজের মুখ ঘষছেন উন্মাদের মত আর বলছেন বল কৃষ্ণ কোথায় গেলে তোমা পাব। মুখ, নাক ক্ষতবিক্ষত, তবুও বিরাম নেই। মহাপ্রভুর এই দৃশ্যকে পণ্ডিত রোমা রোলার ধারণা এপিলেপসিতে মহাপ্রভু মারা গেছেন।"[৩]

মধ্যযুগের কবি চন্ডীদাস বলেছেন – 'সবার উপর মানুষ সত্য/ তাহার উপরে নাই'। মধ্যযুগের সাধক, সমাজ সংস্কারক বা কবিরা যে মানবতার জন্য জয়গান করেছেন তাদেরই পথ অনুসরণ করে আধুনিক যুগের কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ঘোষনা করেছেন- 'জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু'। সে জাতির নাম মানব জাতি। আবার নজরুল লিখেছেন – 'গাহি সাম্যের গান।

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 01
Website: https://tirj.org.in, Page No. 01 - 08
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানুষের চেয়ে বড়ো কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান'। মানুষকে ঘৃণা করা কোন ধর্মের কথা নয়। সমস্ত ধর্মের মূল কথা হল মানুষকে ভালোবাসা। এই ভালোবাসার কথা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন শ্রীচৈতন্যদেব। চৈতন্যদেব মানুষকে ভালোবাসতে শিখিয়েছেন, ভালোবাসার পথ দেখিয়েছেন তাই তিনি মানব পথিক। সমস্ত কুসংস্কার, অন্ধকার, জড়তা, অক্ষমতা, অস্থিরতা, মূঢ়তা, দৃষ্টিহীনতাকে দূরে সরিয়ে আমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছেন প্রেম, ভক্তি এবং ভালোবাসার মন্ত্র। 'প্রেম পৃথিবীতে একবার মাত্র রূপগ্রহণ করিয়াছিল, তাহা বঙ্গদেশে।' বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত ঐতিহাসিক পরলোকগত সাহিত্যিক দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় এই উক্তি করেছেন। কথাটি তাঁর একার নয়। কথাটি অধিকাংশ বাঙালির। চৈতন্যদেব তাঁদের অনেকের কাছে প্রেমের অবতার, আবার অনেকের কাছে জীবন্ত বিগ্রহ। চৈতন্যদেবের জীবন, কর্ম এবং আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে ভাগবতের আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত। চৈতন্য দেব যেহেতু ভাগবতকে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন সেজন্য তিনি মানুষকে ভালোবেসে ছিলেন। তার ভালোবাসা ছিল প্রকৃত অর্থে সত্য সেখানে জাত পাত উচ্চ, নীচ কোন ভেদাভেদ ছিল না, ছিল মানুষকে ভালোবাসার মন্ত্র। তার উজ্জ্বল উদাহরণ যবন হরিদাস প্রসঙ্গ। "কোন কোন উৎসাহী হিন্দু মনোহরের পশ্চাতে চক্রবর্তী যোগ করিয়া হরিদাসকে ব্রাহ্মণকুমার প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। যে অসাম্প্রদায়িক উদারতা হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের আবির্ভাব, পুনরায় তাহাকে সাম্প্রদায়িকতার গহ্বরে টানিয়া আনিবার জন্য পরবর্তীয়দের এই অপপ্রয়াস। হরিদাস কিন্তু সর্বদাই 'ম্লেচ্ছাধম' বলিয়া নিজের পরিচয় দিয়াছেন। বর্তমান খুলনা জেলার অন্তর্গত বুঢ়ন পরগণায় সোনাই নদীর তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামে অনুমান ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে হরিদাসের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম মুসলমানি নাম অজ্ঞাত। বৃন্দাবনদাস লিখিয়াছেন – 'বুঢ়ন গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস'। (চৈঃ ভাঃ, পৃঃ ১১৮)। জয়ানন্দ বলেন – 'স্বর্ণ-নদী তীরে ভাটকলাগাছি গ্রাম, হীন কুলে জন্ম হয় উপরি পূর্ব্ব নাম।' জয়ানন্দও বুঢ়নের কথা বলেন - 'বুচন হইতে আইলা হরিদাস।' জয়ানন্দ, বৃন্দাবনদাসের পরে গ্রন্থ লিখিয়াছেন। সম্ভবতঃ বৃন্দাবনদাসকে কিছুটা সংশোধন করিয়াই জয়ানন্দ লিখিয়াছেন যে-সোনাই নদী তীরে ভাটকলাগাছি গ্রামেই হরিদাসের জন্ম হয়। বুঢ়ন একটি পরগণা-গ্রাম নহে।"[৪]

চৈতন্যদেব হরিদাসকে সভাপরিষদ হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন। তৎকালীন সমাজে ব্রাক্ষন ছাড়া সাধারণ মানুষের হিন্দু ধর্মে উপরের আসনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার কোন জায়গা ছিল না। চৈতন্যদেব সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন। মানুষের মধ্যেই ভগবান আছে মানুষকে ভালোবাসলেই ভগবানকে ভালোবাসা যায়। প্রতিটি মানুষের মধ্যে, প্রতিটি জীবের মধ্যে প্রতিটি প্রাণের মধ্যে ভগবান আছে এই সত্যকে যথযথভাবে উপলব্ধি করেছেন নদের নিমাই।

চৈতন্যদেবের অনেক আগে রামানন্দ সম্পর্কে ভক্তমাল গ্রন্থে দেখতে পাই- 'ভক্তির দ্বারাই শ্রেষ্ঠতা, জন্ম দ্বারা নহে।' রামানন্দের শিষ্য কবীর উপলব্ধি করেন খোদা যদি মসজিদেই বসবাস কারণ তাহলে আর সব মুলুক করে? তীর্থে মূর্তিতে রামের আবাস। এই দ্বৈত ভাবের মধ্যে সত্য কোথায়? পূর্বদিকে হরির বাস আর পশ্চিমে আল্লার মোকাম খুঁজে দেখো হৃদয়ের মধ্যেই রাম রহিমান বিরাজমান। তাহাকে অন্বেষণ কর হৃদয় গুহায়, সাধকের হৃদয় স্বর্গে ও মানব প্রেমে। চৈতন্যদেব এই ভাবাকাশের জীবন্ত প্রতীক। সুতরাং তার কর্ম এবং আদর্শ তার পূর্বগামী সাধকদের আদর্শেরই পরিণতি।

চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী যেসব সাধক সমাজ সংসারের চেষ্টা করেছিলেন তারা অধিকাংশই সমাজের নিম্নস্তর থেকে উদ্ভূত হয়েছিলেন। চৈতন্য পূর্বগামীদের মধ্যে নামদেব ছিলেন দরজী, নানক ছিলেন চাষীর সন্তান, কবীর জোলা মুসলমান। অধিকাংশই নীচকুলজাত। আমাদের আলোচ্যমনি চৈতন্যদেব ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরিবারের আর্থিক অবস্থা সাধারণ। চৈতন্যদেবের পারিষদদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অদ্বৈত আচার্য আর নিত্যানন্দ ও যবন হরিদাস। এই যবন হরিদাস ছিল মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। এইসব দৃষ্টান্ত দেখে বোঝা যায় সমাজের নিম্নবর্গের মানুষজনকে তিনি ঐক্যবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। কেননা সামাজিক রাষ্ট্রীয় অরাজকতার মধ্যে সমাজের নিম্ন শ্রেণির অধিবাসীরাই পীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয় সর্বাপেক্ষা বেশি। তাই উচ্চ নীচ ভেদাভেদ ভুলে তিনি সকলকে ভালোবাসা দিয়ে ছিলেন।

চৈতন্যদেবের হরিনাম প্রচারের ফলে ক্রমশ সর্বসাধারণের মধ্যে প্রীতি, ভালোবাসা ও ঐক্যবৃদ্ধি এবং ঈর্ষা, ভেদ বৈষম্যের ভাব কমতে আরম্ভ হল। নিমাই এর ইচ্ছানুযায়ী নবদ্বীপের সর্বত্র বিশেষতঃ - অলিতে গলিতে ঘুরে পতিত, কাঙ্গাল দীনদুঃখী ও নিম্নশ্রেনীর মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচার করলেন নিত্যানন্দ ও হরিদাস। সেই সময় নবদ্বীপে জগন্নাথ ও মাধব নামে দুই ভাই নগর রক্ষার কাজে নিযুক্ত ছিল। ব্রাম্মন সন্তান হলেও তারা সদাচার, স্বধর্ম ভুলে, গুন্ডামি মাতলামি করে দিন

কাটাত। নিমাইয়ের ধর্মপ্রচার হরিনামসংকীর্তন তাদের মোটেই ভালো লাগত না। একদিন নিমাই হরিনাম প্রচার করার জন্য রাস্তায় চলেছেন, জগাই মাধাই নিতাইকে দেখে ক্ষেপে গেল। মাধাই এর হাতে ছিল মদের কলসী, ছুঁড়ে মারল নিমাই এর মাথায়। মাটির কলসীর আঘাতে নিমাই আহত হলে ভক্তগন সহ নিমাই ছুটে আসলেন। আজ নিমাই এর রুদ্র মূর্তিদেখে সকলে ভয় পেলেন। আকুলচিত্তে জগাই মাধাই ক্ষমাভিক্ষা চাইল, কিন্তু নিমাই ক্ষমা করলেন না। পরবর্তীকালে চৈতন্যদেব জগাই মাধাইকে ক্ষমা করেন। এইরূপ মতামত ও উদাহরণে চৈতন্যের উদার মানবিকতার পরিচয় আমরা পেয়ে থাকি। নিমাইয়ের দলবৃদ্ধি ও প্রভাব প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে নিমাইয়ের শত্রুদল, উপায় না দেখে দল বেঁধে কাজীর কাছে নালিশ করলেন- নিমাই পণ্ডিতের জ্বালায় নবদ্বীপে থাকা দায় হইয়াছে। সমস্ত কিছু শুনে কাজীসাহেব নবদ্বীপে হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন। নিমাই বিন্দুমাত্র ভয় না করে বললেন - ভাল করিয়া আজ নগর কীর্তনের ব্যবস্থা করিতে হইবে ভক্তগনকে উৎসাহিত করেনও। সেদিন ভক্তগণকে নিয়ে মহাকীর্তনের ব্যবস্থা করলেন। রাত্রির অন্ধকারে শতশত মশালের আলো, খোল করতাল শিঙ্গার শব্দ সহ সংকীর্তনের রোল আর অসংখ্য জনতার মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে কঠোর হৃদয় কেঁপে গেল। কাজীর বাড়ির সামনে কীর্তন শেষ করা হল। কাজী সাহেবকে নিমাই বোঝালেন - ভগবানকে ভক্তি করা, তার চিন্তা ও তার নাম জপ করা সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। কীর্তনে তার নাম যপ হয়, তার চিন্তা হয়, ভাবশক্তি বৃদ্ধি পায় ইত্যাদির মধ্যে মানুষ পরমানন্দ লাভ করে। জীবের ত্রিতাপ জ্বালায় শান্তি হয়। নিমাইয়ের বিনম্র ব্যবহার, সুমধুর বাক্য, গভীর তত্ত্বোপদেশে কাজীর হৃদয় গলে গেল। সেদিন থেকে তিনি নিমাই এর অনুরাগী হয়ে ওঠেন। নিমাই বিশ্বাস করতেন সব মানুষই সমান। সব মানুষেরই মধ্যে লুকিয়ে আছে ঈশ্বর তাই তিনি উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ঘুচিয়ে ঘোষনা করলেন- অন্যজ শ্রেণির মানুষেরাও হরি নাম জপলে তারা বরণীয় ও স্মরণীয় হয়ে ওঠেন। বলাবাহুল্য, সমাজে, দেশে বাধা দূর হল, সমাজ এগোতে লাগল এক মানবিক পৃথিবীর দিকে। যে পৃথিবীর স্লোগান - 'মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য।' মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনে দুটি নারী অধিকার স্থাপন করেছিল। যার একদিকে আছে বল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী অন্যদিকে আছে সনাতন কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী। প্রথমে আমরা দেখে নেব যে চৈতন্যের জীবনে প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী কতটা স্থান দখল করেছিল। বৃন্দাবন দাস তার 'চৈতন্য ভাগবত' গ্রন্থে বর্ণনা দিচ্ছেন যে - গঙ্গার ঘাটে চৈতন্যের সঙ্গে লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর দেখা এবং ভালোবাসার সূচনা। রাধা কৃষ্ণের পূর্বরাগের আলোকে কবি এক অপরূপ বর্ণনা দিয়েছেন। আবার লোচন দাস এপ্রসঙ্গে বলে গেছেন। গঙ্গার তীরে দুই নরনারীর প্রথম দেখা, প্রণয়ের সূচনা এবং বিবাহের ক্ষেত্রস্থল বর্ণণাতেও অসামান্যতার পরিচয় দিয়েছেন। এরপর বনমালী ঘটক লক্ষ্মীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের বিবাহ প্রস্তাব নিয়ে শচীমাতার কাছে যায়। শচীমাতা প্রাথমিকভাবে এই বিবাহে সম্মতি হননি। তাঁর ইচ্ছা ছিল পুত্র আগে পড়াশোনা করে বড়ো হোক, প্রতিষ্ঠিত হোক, তারপর বিবাহ। বাড়ি ফেরার পথে বনমালীর সঙ্গে চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ হয়। এরপর নিমাই মায়ের কাছে বনমালীর ফিরে যাবার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করলে পুত্রের মনোগত ইচ্ছা বুঝতে পেরে বনমালীকে পুনরায় ডেকে পাঠান এবং বিবাহে সম্মতি প্রদান করেন। শচীমাতার সম্মতি পেয়ে বনমালী বল্লভাচার্যের কাছে বিবাহ প্রস্তাব পেশ করেন। বল্লভাচার্য নিমাই এর সঙ্গে তার কন্যার বিবাহকে বহু ভাগ্যের পরিনতি বলেই মনে করেন। অনান্য মঙ্গল কাব্যের মত জয়ানন্দ ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল কাব্যেও বিবাহ প্রসঙ্গে এসেছে বাঙালি সংস্কৃতির ছবি। পতিব্রতা নারীরা জড়ো হয়েছেন বিবাহ উপলক্ষে। আবার লোচনের কাব্যে গৌর-নাগরবাদের কথা আছে।

> "গৌরনাগরভাবই নৈষ্ঠিক বৈষ্ণবধর্মের সর্বনাশের পথ প্রস্তুত করিয়াছিল। চৈতন্য-ভক্তগণ যখন নিজেদের নাগরীভাবে কল্পনা করিয়া কাম ও প্রেমকে মিশাইতে গিয়া ভক্তিধর্মের সাত্ত্বিকতা নষ্ট করিয়া ফেলিলেন, তখনও তাহা ততটা মারাত্মক হয় নাই; কিন্তু লোচনের মতো যখন তাঁহারা নদিয়ার বিবাহিতা রমণীদিগকেও চৈতন্য-প্রেমে পাগলিনী করিয়া আঁকিলেন, তখন হইতেই মহাপ্রভু ও বৃন্দাবনের গোস্বামী-প্রভুদের বৈষ্ণবধর্ম, দর্শন ও আচারনিষ্ঠা বৈষ্ণব সহজিয়াদের কবলগ্রস্ত হইল, মননশীল দার্শনিকতা ক্রমেই আবেগপ্রবল ধর্মকৃত্য ও রহস্যাচারী 'কাল্ট'-এর অন্তর্ভুক্ত হইয়া ক্রমে ক্রমে সমাজের সুড়ঙ্গের গভীরে চলিয়া গেল।"[৫]

তারা গৌরাঙ্গ প্রেমে আকুল। তাদের অন্তরে সেই নাগরী ভাবনাকে জয়ানন্দ ফুটিয়ে তুলেছেন অত্যন্ত সুকৌশলে।

কুলবতীরা এখানে যেসব কথা ব্যক্ত করেছেন তাতে লোচন, গুরু নরহরি সরকার যিনি গৌর-নাগরবাদের প্রতিষ্ঠাতা, তার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন বাঙালি সংস্কৃতি পালনের মধ্য দিয়ে নিমাই ও লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর বিবাহ হয়। এরপর লক্ষ্মীদেবী পতিগৃহে প্রবেশ করেন। নিমাই ও লক্ষ্মীদেবীকে দেখে বিশেষ স্ত্রীগন উক্তি করে ওঠেন। নিমাই ও লক্ষ্মী দেবীর বিবাহের পর শচীগৃহ জ্যোতিধামে পরিনত হয়। সেকথা আমরা শচীদেবীর উক্তিতেই পেয়ে থাকি- লক্ষ্মীদেবীর আবির্ভাবে শচীগৃহ দারিদ্র মুক্ত হয়েছিল। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সঙ্গে নিমাইয়ের দাম্পত্য জীবন খুব সুন্দর ভাবে কাটছিল। তাঁর দৃষ্টান্ত আমরা বৃন্দাবন দাসের 'চৈতন্যভাগবত' গ্রন্থে পেয়ে থাকি। এখানে আমরা এক সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত হতে দেখি।

চৈতন্যদেবের হৃদয়ে সমস্ত বঙ্গদেশ পরিভ্রমনের ইচ্ছা জাগলে লক্ষ্মীদেবীকে মার দেখাশোনার ভার দিয়ে নিমাই গেলেন পদ্মাতীরে। দীর্ঘদিন চৈতন্য বিরহে দিন কাটাতে কাটাতে তার ইচ্ছা হয় চৈতন্যের কাছে যাবার। দীর্ঘদিন চৈতন্যকে কাছে না পেয়ে তিনি গঙ্গাবক্ষে আত্মাহূতি দেন এ তথ্য আমরা বৃন্দাবনদাসের কাছে পেয়ে থাকি। কিন্তু জয়ানন্দ ও অনান্য-জীবনীকারেরা লক্ষ্মীদেবীর মৃত্যুর কারন হিসাবে সর্পদংশনকে চিহ্নিত করেছেন।বিষ জ্বালায় কাতর লক্ষ্মীদেবী বলেন- 'বিষ জ্বালায় মরি মা চোক্ষে নাহি দেখি'। মৃত্যুর আগে লক্ষ্মী দেবী তার স্বামীর স্মৃতিচিহ্ণ বুকে রাখতে চেয়েছিলেন তা জানা যায় কবি জয়ানন্দের কাব্য থেকে। এই চরনগুলি পাঠ করলে একালেও নিমাই ও লক্ষ্মী দেবীর দাম্পত্য জীবনের গভীরতা ও প্রেম ভালোবাসার ছবি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিমাই বঙ্গদেশে যাবার আগে যেমন তার একান্ত প্রিয়জনকে নিজের চিহ্ন দিয়ে যেতে ভোলেন নি, ঠিক একইভাবে মৃত্যু যখন আসন্ন তখন স্বামীর দিয়ে যাওয়া সেই স্মৃতিচিহ্নকে আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিলেন। স্বভাবতই দুমাস পর যখন নিমাই ফিরে এলেন তাঁর একান্ত প্রিয়জনের বিয়োগের কথা শুনিয়া তিনি স্থির থাকতে পারলেন না। আর কি কোনো একনিষ্ঠ প্রেমিক পুরুষের পক্ষে সংসারবৃত্তে থাকা সম্ভব? এই হঠাৎ আঘাতই কি তাকে সংসারবৃত্ত থেকে ছিন্নমূল করে দেয়নি? মনস্তত্ত্বের বিচারে এই ভাবনাই স্বাভাবিক।

কিন্তু সময়টা মধ্যযুগ স্বভাবতই ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের অন্যান্য চৈতন্য জীবনীকারেরা নিমাই এর সন্ন্যাস গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্য কারন সংযুক্ত করেছে। মাতা শচীদেবী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী মারা যাবার পর আর পাঁচজন মায়ের মতো চেয়েছিলেন পুত্রকে সংসারী করতে। এরপর কাশীনাথ পন্ডিতের সহযোগিতায় অদ্বৈতর পরম বৈষ্ণব সনাতন কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে নিমাইয়ের বিবাহের কথা হয়। লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পিতা বল্লভাচার্য যেমন নিমাই এর সাথে নিজ কন্যার বিবাহে আনন্দিত হয়েছিলেন, অনুরুপ ছবি ফুটে ওঠে সনাতন পণ্ডিতের মনে। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিমাই ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। প্রথমা স্ত্রী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী মারা যাবার পর একনিষ্ঠ প্রেমিক চৈতন্যের মনে যে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল তা হয়তো দ্বিতীয় সহধর্মিনী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী পূরন করতে পারেননি। তাই যেন দাম্পত্য জীবন থেকে মুক্তি লাভের আশায় চৈতন্যদেব গয়াগমন করেন। সেখানে ঈশ্বরপুরীর সাথে সাক্ষাৎ হয় এবং তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

> "এই দীক্ষার ফলস্বরূপ তাঁহার জীবনে অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বার খুলিয়া যায় ও ক্রমশঃ ভগবৎ-সাধনা তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া বসে। তিনি পাণ্ডিত্যের অভিমান, বুদ্ধির গর্ব, সমস্ত বিসর্জন দিয়া ধ্যানতন্ময়, দিব্যভাব বিভোর হইয়া পড়িলেন ও ঐশী লীলার স্ফূরণ তাঁহার বাস্তব চেতনাকেও অভিভূত করিল।"[৬]

এই গয়াভূমি থেকে চৈতন্য ফিরে এলে মাতা শচী ও পত্নী আনন্দিত হয়েছেন। কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াকে দেখে চৈতন্য খুশি হননি। শচীমাতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে পুত্রের কাছে এনে বসালেও চৈতন্য তাঁর দিকে ফিরেও চাইনি। মৃত্যুর পরেও লক্ষ্মীদেবীকে চৈতন্য ভুলতে পারেননি তাই হয়তো বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর প্রতি বঞ্চনা বেড়ে গেছে। নরহরি সরকারের শিষ্য লোচনদাসের 'চৈতন্য মঙ্গল কাব্যে গৌর-নাগরবাদের কথা আছে। তাঁর কাব্যেই আমরা বলতে পারি, সন্ন্যাস গ্রহনের পূর্বে চৈতন্যদেব বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সঙ্গে রমন করেছিলেন। এইভাবে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াকে শান্ত করেছিলেন। চৈতন্য সন্ন্যাস ধর্মগ্রহণ করলে মাতা শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়া প্রচন্ড দুঃখ পেয়েছিলেন। আবার জয়ানন্দের কাব্যে আমরা বিষ্ণুপ্রিয়ার বারোমাস্যার বর্ননা

দেখতে পাই। রবীন্দনাথ তাঁর 'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের বিভিন্ন নরনারী, তাঁদের পত্নীদের তারা উপেক্ষার ছবি এঁকেছেন। যেমন লক্ষন পত্নী-উর্মিলার কথা প্রথমেই আসা যাক অনুরুপ ভাবে মধ্যযুগের চৈতন্য-জীবনীকারেরা চৈতন্যকে মহাপুরুষ রূপে দেখতে গিয়ে ক্ষুদ্রনারী বিষ্ণুপ্রিয়াকেও উপেক্ষা করে গেছেন। এইভাবে বিষ্ণুপ্রিয়া হয়ে উঠেছে একজন বঞ্চিতা নারীর প্রতিচ্ছবি।

Reference:

১. দাস, বৃন্দাবন, 'শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত', দ্বিতীয় সংস্করণ, গৌড়ীয় মঠ, ৪৪২ গৌরাব্দ, পৃ. ৩৯
২. সেন, সুকুমার, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', আনন্দ, ২০১৬, পৃ. ২৩১
৩. ঘোষ, প্রদ্যোত (সম্পাদিত), 'শ্রীচৈতন্য : জীবন-সাহিত্য-দর্শন', ১৯৬৩, কলকাতা, পৃ. ৪৪
৪. রায়চৌধুরী, গিরিজাশঙ্কর, 'শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার পার্ষদ', কলিকাতা, ১৯৫৭, পৃ. ৩৩
৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিতকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', কলকাতা, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, ২০২১, পৃ. ২৫৭
৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার, 'বাংলা সাহিত্যের বিকাশের ধারা', কলকাতা, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, ১৪২৬, পৃ. ৯৪